ধ্বনিপরিবর্তন

ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা ও সূত্র - ভাষার বহিরঙ্গগত কারণে ধ্বনিপরিবর্তন - বহিরঙ্গগত কারণে বিভিন্ন ভাষায় যে সব বহু বিচিত্র ধরণের ধ্বনিপরিবর্তন হয়েছে এবং হয়ে চলেছে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা তা পর্যবেক্ষণ করে, তা থেকে ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্রগুলি প্রধানত চারটি ধারায় বিভক্ত করেছেন।
১) ধ্বনির আগম, ২) ধ্বনির লোপ, ৩) ধ্বনির রূপান্তর ও ৪) ধ্বনির স্থানান্তর ও বিপর্যাস।

ধ্বনির আগমঃ উচ্চারণ কালে মূল শব্দে যতগুলি ধ্বনি থাকে তার সঙ্গে শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে অতিরিক্ত ধ্বনি যোগ হলে তাকে ধ্বনির আগম বলা হয়। ধ্বনির আগমে - স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটে। কোন কোন অপিনিহিতি স্বরাগমের মধ্যে পড়ে।

আদি স্বরাগম ও ব্যঞ্জনাগমঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্যে অথবা অন্য কোন কারণে শব্দের আদিতে কোন স্বরধ্বনির আগমনকে আদি স্বরাগম [বাংলায় সাধারণত আকার বা ইকারের আগম ঘটে] এবং ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমনকে আদি ব্যঞ্জনাগম বলা হয়। [বাংলায় যে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি আছে সেখানেই শুধু 'র' এর আগম হয়, শব্দের আদিতে অন্য কোন ব্যঞ্জনের আগম হয় না]। যেমন -
আদি স্বরাগম - স্পর্ধা > আস্পর্ধা। স্টেশন > ইস্টিশান।
আদি ব্যঞ্জনাগম - ঋজু > উজু > রুজু [এখানে 'উ' এর আগে 'র' এর আগম হয়েছে।] উপাধ্যায় > উব্জঝাঅ (প্রাকৃত) > ওঝা (বাংলা) > রোজা ['ও' এর আগে 'র' এসেছে।]

মধ্যস্বরাগম / বিপ্রকর্ষ / স্বরভক্তিঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্যে অথবা ছন্দের প্রয়োজনে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বরধ্বনি এনে দুই ব্যঞ্জনধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করার রীতিকে স্বরভক্তি বলা হয়।
যেমন - কর্ম > করম। ভক্তি > ভকতি [ভ্ + অ + ক্ + ত্ + ই > ভ্ + অ + ক্ + অ + ত্ + ই] জন্ম > জনম ইত্যাদি।

অপিনিহিতিঃ শব্দও মধ্যে য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন 'জ্ঞ' বা 'ক্ষ' থাকলে তার আগে একটি 'ই' এর আগম হয়, এটি আসলে মধ্যস্বরাগম। এটি অপিনিহিতির একটি রূপও বটে।
যেমন - পূর্ব বাংলার উচ্চারণে - বাক্য > বাইক, যজ্ঞ > যইগ্গ ইত্যাদি।

মধ্যব্যঞ্জনাগম / শ্রুতিধ্বনিঃ শব্দের ধ্বনিগুলি উচ্চারণ করার সময় আমাদের জিহ্বা অসাবধানতাবশত দুটি ধ্বনির মাঝখানে কোন অতিরিক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে ফেললে সে প্রক্রিয়াকে মধ্যব্যঞ্জনাগম বলে। এইভাবে যে অতিরিক্ত ধ্বনিটি শব্দের মাঝখানে উচ্চারিত হয়ে যায় তাকে শ্রুতিধ্বনি বলে। শব্দও মধ্যে যে ব্যঞ্জনের আগম হয় সেই ব্যঞ্জনের নাম অনুসারে শ্রুতির নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন - য় - শ্রুতি - মোদক > মোঅঅ ('দ' ও 'ক' এর লোপ) > মোয়া ('য়' এর আগম)। লৌহ > নোআ ('ল' স্থানে 'ণ' এর উচ্চারণ 'হ' এর লোপ) > নোয়া ('য়' এর আগম)।
ওয় - শ্রুতি - যা (to go, ধাতু) + আ (প্রত্যয়) > যাওয়া (ওয় এর আগম)।
হ - শ্রুতি - সং বিপুল > প্রাঃ বিউলা ('প' এর লোপ) > বিহুলা (' হ' এর আগম) > বেহুলা।
দ - শ্রুতি - বৈদিক সূনর > ধ্রুপদী সংস্কৃত সুন্দর ('দ' এর আগম)।
ব - শ্রুতি - সং তাম্র > তম্বর ('ব' এর আগম) > প্রাঃ তম্ব > বাং তাঁবা ইত্যাদি।

অন্ত্যস্বরাগম ও অন্ত্যব্যঞ্জনাগমঃ সাধারণত বাংলা ভাষায় শব্দের শেষে যুক্ত ব্যঞ্জনের পরে কোন না কোন স্বর থাকে, যা অনেক ক্ষেত্রেই অন্য ভাষায় থাকে না।[যেমন - ইংরেজি] এইরকম শব্দ যখন আমরা বাংলা ভাষায় গ্রহণ করি তখন বাংলা রীতি অনুযায়ী সেগুলোর শেষে সাধারণত একটি অতিরিক্ত স্বরধ্বনি যোগ করে উচ্চারণ করি। এই প্রক্রিয়াকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যেমন - বেঞ্চ (ব্ + এ + ন্ + চ্) > বেঞ্চি (ব্ + এ + ন্ + চ্ + ই)। আরবী - কিস্ত্ > কিস্তি। ফারসী - জুল্ফ > জুল্ফি ইত্যাদি। ডঃ সুকুমার শেনের মতে অন্ত্যস্বরাগমের মতো অন্ত্যব্যঞ্জনাগমও হতে পারে অর্থাৎ শব্দের শেষে

ব্যঞ্জনধ্বনির আগম হতে পারে। যেমন - সং সর্ব + জি > সর্বজিৎ; ভূ + ভৃ > ভূভৃৎ । বাং খোকা > খোকন; বাবু > বাবুন ইত্যাদি।

ধ্বনিলোপঃ ধ্বনির লোপ জনিত ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। ধ্বনির লোপ তিনভাবে ঘটে। সবদ্যার আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে। ধ্বনি লোপে দুরকম ধ্বনিরই লোপ ঘটে। যথা - স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

আদিস্বরলোপঃ সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত না থেকে যদি শব্দের মধ্যবর্তী কোন অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকে তবে আদি স্বরধ্বনিটি গৌণ ক্রমশ ক্ষীণ উচ্চারিত হয় এবং শেষে লোপ পায় তখন তাকে আদিস্বরলোপ বলা হয়। যেমন - অলাবু > লাউ ('অ' লোপ), উদ্ধার > ধার ('উ' লোপ)।

মধ্যস্বরলোপঃ সাধারণত শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনি ক্ষীণ হয়ে ক্রমশ লোপ পেয়ে যায়। তখন তাকে মধ্যস্বরলোপ বলা হয়। যেমন - গামোছা > গামছা ('ও' কার লোপ), সুবর্ণ (স্ + উ + ব্ + অ + র + ণ্ + অ) > স্বর্ণ (স্ + ব্ + অ + র্ + ণ্ + অ) ['উ' কার লোপ]।

অন্ত্যস্বরলোপঃ স্বাভাবিক উচ্চারণে প্রায়ই শব্দের শেষের দিকে শ্বাসের জোর কমে আসে এবং শব্দের শেষে অবস্থিত স্বর ক্ষীণ উচ্চারিত হতে হতে শেষে লোপ পায়। যেমন - রাশি > রাশ ('ই' কার লোপ)।
সং - সন্ধ্যা > প্রাঃ - সঞ্ঝাঁ > বাং - সাঁঝ ('আ' কার লোপ) [স্ + আঁ + ঝ]।

দ্ব্যক্ষরতা / দ্বিমাত্রিকতাঃ বাংলা উচ্চারণে স্বাভাবিক প্রবণতার ফল - স্বরূপ অনেক শব্দের দুটি আলাদা আলাদা অক্ষর (syllable) মিলে একটি অক্ষর হিসাবে উচ্চারিত হয়, যাকে দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা বলা হয়। যেমন -
গামোছা (গা + মো + ছা তিন অক্ষরের শব্দ) গাম্ছা (গাম্ + ছা - দু অক্ষরের শব্দ) হয়েছে।
অপরাজিতা > অপ্রাজিতা পাঁচ অক্ষরের শব্দ চার অক্ষর হয়েছে।

ব্যঞ্জনধ্বনির লোপঃ স্বরধ্বনি যেমন শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত্যে যেকোন স্থান থেকেই লোপ পেতে পারে, ব্যঞ্জনধ্বনি তেমন লোপ পায় না। আদি ও অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপের নিদর্শন আধুনিক বাংলায় কম দেখা যায়। চলিত বাংলায় 'হ' ধ্বনির লোপ প্রায়ই দেখা যায়। যেমন - খড়দহ > খড়দঅ > ('হ' এর লোপ) > খড়দা। তেমনি ফলাহার > ফলার।

অনুনাসিক ব্যঞ্জন লোপের নিদর্শন কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। যেমন - পঙ্ক > পাঁক। ('ঙ' লোপ পেয়েছে) তবে এটাকে ধ্বনির লোপ না বলে রূপান্তর বলা ভালো। কারণ 'ঙ' লোপ পেয়ে চন্দ্রবিন্দু 'ঁ' হয়েছে।

সমাক্ষর লোপঃ কোন শব্দে পাশাপাশি দুটি সমধ্বনি বা অক্ষরের সহাবস্থান ঘটলে অনেক সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্যে একটার লোপ হয়, তখন তাকে সমাক্ষর লোপ বলা হয়। যথা - পাদোদক > পাদক [একটি ধ্বনি 'দ' এর লোপ হয়েছে]।
বড়দাদা > বড়দা।

সমবর্ণ লোপঃ শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমবর্ণ বা সমাক্ষরের শুধু একটি লেখার বানানে লোপ পায় কিন্তু লোকের মুখে উচ্চারণে ঠিকই থাকে। একে সমবর্ণ লোপ বলা হয়। যেমন ইংরেজিতে আগে - কৃষ্ণনগর (Krishnanagar) লেখা হতো Krishnagar, একটি ‘na’ বাদ দিয়ে। কিন্তু লোকের মুখে দুটি 'ন' ঠিকই উচ্চারিত হয় - ক্রিশ্নোনগর [ ] ।

ধ্বনির রূপান্তরঃ অনেক ক্ষেত্রে ধ্বনির লোপ বা আগমন না হয়ে ধ্বনির পরিবর্তন হয়, যাকে ধ্বনির রূপান্তর বলা হয়। স্বরধ্বনির রূপান্তরগুলোর মধ্যে অন্যতম হলোঃ

অভিশ্রুতিঃ অভিশ্রুতি হলো অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপ। (দু - অক্ষরের শব্দের অপিনিহিতির পর অভিশ্রুতি লক্ষ করা যায় না।) অপিনিহিতির সময় শব্দের অন্তর্গত যে, 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে সরে আসে, সেই 'ই' বা 'উ' যখন

পাশাপাশি স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেও তার সঙ্গে মিশে পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন - করিয়া (ক্ + অ + র্ + ই + য়্ + আ) > কইর‍্যা (ক্ + অ + ই + র্ + য়্ + আ) যে 'ই' ছিলো 'র' এর পরে তা এখানে 'র' এর আগে সরে এসেছে - এইটা অপিনিহিতি কইর‍্যা [অপিনিহিতি] > করে [অভিশ্রুতি]। 'ই' কার এর প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি য-ফলার পরবর্তী স্বরধ্বনি 'আ' কার পরিবর্তিত হয়ে 'এ' কার হয়েছে।

স্বরসঙ্গতিঃ শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অথবা প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত দুটি পৃথক স্বরধ্বনির পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একইরকম ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়াকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন - সুপারি (স্ + উ + প্ + আ + র্ + ই) > সুপুরি (স্ + উ + প্ + উ + র্ + ই) উচ্চারণের সুবিধাই এর মূল কারণ।

স্বরসঙ্গতিতে দুটি পৃথক স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একেবারে একইরকম হয়ে গেলে তাকে পূর্ণ স্বরসঙ্গতি এবং প্রায় একইরকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে আংশিক স্বরসঙ্গতি বলে। সুপারি > সুপুরি [পূর্ণ], পূজা > পুঁজো [আংশিক]।

স্বরসঙ্গতিকে ধ্বনি পরিবর্তনের গতিমুখ অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

১) প্রগত স্বরসঙ্গতিঃ পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একইরকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে রূপান্তরিত তাকে বলা হয় প্রগত স্বরসঙ্গতি। যেমন - দিশাহারা > দিশেহারা।
(দ্ + ই + শ্ + আ + হ্ + আ + র্ + আ) > (দ্ + ই + শ্ + এ + হ্ + আ + র্ + আ)।

২) পরাগত স্বরসঙ্গতিঃ পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একইরকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে পরাগত স্বরধ্বনি বলা হয়। যেমন - দেশি > দিশি। (দ্ + এ + শ্ + ই) > (দ্ + ই + শ্ + ই)।

৩) অন্যোন্যঃ যদি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুটি স্বরধ্বনিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়ে একওইরকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন তাকে পারস্পরিক বা অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলা হয়। যেমন - যদু > যোদো।

সমীভবনঃ শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত বা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত দুটি বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি অর্থাৎ দুটি পৃথক ধরনের ব্যঞ্জনধ্বনি যখন একে ওপরের প্রভাবে বা দুটিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একওইরকম ধ্বনিতে বা প্রায় অনুরূপ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন সেই প্রক্রিয়াকে সমীভবন বলা হয়। যেমন - উৎ + লাস > উল্লাস ('ল' এর প্রভাবে 'ৎ' পরিবর্তিত হয়ে 'ল' হয়েছে)।
সমীভবন ধ্বনি পরিবর্তনের গতিমুখ অনুসারে সমীভবনের তিনটি ভাগ। যথা -

১) প্রগত সমীভবনঃ পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে যদি কখনো পরবর্তী ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে প্রগত সমীভন বলে। যেমন - পদ্ম > পদ্দ - এখানে 'দ' এর প্রভাবে 'ম' পরিবর্তিত হয়ে 'দ' হয়েছে।

২) পরাগত সমীভবনঃ পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি যদি কখনো পরিবর্তিত হয়ে একইরকম ধ্বনি বা প্রায় কাছাকাছি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে বলা হয় পরাগত সমীভবন। যেমন - ধর্ম (ধ্ + অ + র্ + ম্ + অ) > ধম্ম (ধ্ + অ + ম্ + ম্ + অ), ভক্ত > ভত্ত।

৩) অন্যোন্য সমীভবনঃ পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যদি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দুটি ধ্বনিই পরিবর্তিত হয়ে একইরকম ধ্বনি বা কাছাকাছি ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে বলে পারস্পরিক বা অন্যোন্য সমীভবন। যেমন - উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস - 'ৎ' ও 'শ' পরিবর্তিত হয়ে 'চ' ও 'ছ' হয়েছে। কুৎসা > কেচ্ছা; মহোৎসব > মোচ্ছব ইত্যাদি।

বিষমীভবনঃ সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হলো বিষমীভবন। এই প্রক্রিয়ার দুটি সংযুক্ত বা কাছাকাছি অবস্থিত সমধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে বিষম অর্থাৎ পৃথক ধ্বনিতে পরিণত হয়ে যায়। যেমন - পর্তুগীজ শব্দ আর্মারিও (আ + র্ + ম্ + আ + আ + র্ + ই + ও) > বাংলা আলমারি (আ + ল + ম্ + আ + র্ + ই) দুটি 'র' এর মধ্যে একটা পরিবর্তিত হয়ে 'ল' হয়েছে। লাল > নাল ইত্যাদি।

ঘোষীভবনঃ সাধারণত বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধ্বনি, য়্, র্, ল্, হ্, ড়্, ঢ়্ এবং সমস্ত স্বরধ্বনি হলো সঘোষ ধ্বনি; আর অন্য ধ্বনিগুলো অঘোষ ধ্বনি। কোন সঘোষ ধ্বনির প্রভাবে অঘোষ ধ্বনি যদি সঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয় তবে তাকে ঘোষীভবন বলা হয়। যেমন - চাকদহ > চাগ্‌দা এখানে ঘোষধ্বনি 'দ্' এর প্রভাবে অঘোষ ধ্বনি 'ক্' পরিবর্তিত হয়ে ঘোষধ্বনি 'গ্' এ পরিণত হয়েছে।

ঘোষধ্বনির প্রভাব ছাড়াও আপনা থেকেই কোন কোন সময় পশ্চিমবাংলার উচ্চারণে শব্দের শেষে অবস্থিত একক অঘোষ ধ্বনি সঘোষ উচ্চারিত হয়। একে স্বতোঘোষীভবন বলা হয়। যেমন - কাক > কাগ, লোক > লোগ, ছত্র > ছাত > ছাদ ইত্যাদি।

ঘোষীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া অঘোষীভবন - ঘোষধ্বনি অঘোষ উচ্চারিত হলে সেই প্রক্রিয়াকে অঘষীভবন বলে। যেমন - ফারসি শব্দ গুলাব > বাংলা গোলাপ, বড়ঠাকুর > বট্‌ঠাকুর।

মহাপ্রাণীভবনঃ বাংলায় সাধারণত বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি এবং 'হ' হলো মহাপ্রাণ ধ্বনি, আর অন্য ধ্বনিগুলো হলো অল্পপ্রাণ ধ্বনি। সন্নিকটস্থ বা সংযুক্ত কোন মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবে যদি কোন অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ উচ্চারিত হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে মহাপ্রাণীভবন বলা হয়। যেমন - স্তম্ভ > থাম ['স্' লোপ পেয়ে 'ত্' মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ্' এর প্রভাবে মহাপ্রাণিত হয়ে 'থ' হয়ে গেছে]। পাঁচহালা > পাঁছালা ['হ' এর প্রভাবে 'চ্' হয়েছে নিকটস্থ 'ছ']।

মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব ছাড়া কোন অল্পপ্রাণ ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে মহাপ্রাণ ধ্বনি হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে স্বতোমহাপ্রাণীভবন বলা হয়। যেমন - পুস্তক > পুঁথি [এখানে 'ত' পরিবর্তিত হয়ে 'থ' হয়েছে]।

অল্পপ্রাণীভবনঃ কোন মহাপ্রাণ ধ্বনি যদি অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হয় তবে তাকে অল্পপ্রাণীভবন বলা হয়। যেমন - শৃঙ্খল > প্রাচীন বাংলা শিংকল > শিকল ['খ্' 'ক্' তে পরিবর্তিত হয়েছে]।
পশ্চিম বাংলার রাঢ়ী উপভাষায় প্রায়ই শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন - দুধ > দুদ, বাঘ > বাগ ইত্যাদি। পূর্ববাংলার বঙ্গালী উপভাষাতেও একরকমের অল্পপ্রাণীভবন দেখা যায়। যেমন - ভাই > বাই, ভাত > বাত ইত্যাদি।

নাসিক্যীভবনঃ কোন নাসিক্যব্যঞ্জন ধ্বনি [ম্, ন্, ঙ্, ইত্যাদি] যদি ক্ষীণ হতে-হতে ক্রমশ লোপ পায় এবং তার রেশ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিতে একটা অনুনাসিক অনুরণন যোগ হয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন - বন্ধ [ব্ + অ + ন্ + ধ্ + অ] > বাঁধ [ব্ + আঁ + ধ্] এখানে 'ন্' অনুনাসিক ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে। তার পূর্ববর্তী স্বর 'অ' দীর্ঘ হয়ে অনুনাসিক 'আঁ' তে পরিণত হয়েছে। অন্ধ > আঁক, সন্ধ্যা > সাঁঝ ইত্যাদি।

স্বতোনাসিক্যীভবনঃ শব্দও মধ্যে নাসিক্যব্যঞ্জন না থাকলেও অনেক সময় কোন কোন স্বরধ্বনি আপনা থেকেই অনুনাসিক উচ্চারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলা হয়। যেমন - পুস্তক > পুঁথি ['উ' ধ্বনি অনুনাসিক হয়েছে আপনা থেকেই], পেচক > পেঁচা ইত্যাদি।

বিনাসিক্যীভবনঃ অনেক সময় শব্দের অন্তর্গত কোন নাসিক্যব্যঞ্জন লোপ পায় কিন্তু তার কোন প্রভাব বা রেশ রেখে যায় না। একে বিনাসিক্যীভবন বলা হয়। যেমন - শৃঙ্খল > শিকল [এখানে 'ঙ' লোপ পেয়েছে অন্য কোন অনুনাসিক ধ্বনি হয়নি]।

ধ্বনির স্থানান্তরঃ

বিপর্যাসঃ শব্দের মধ্যে কাছাকাছি অবস্থিত বা সংযুক্ত দুটো ধ্বনি যদি নিজেদের মধ্যে স্থান বিনিময় করে তবে ধ্বনির সেই স্থান বিনিময়কে বিপর্যাস বলে। যেমন - বাক্স > বাস্ক [ব্ + আ + ক্ + স্ + অ] > [ব্ + আ + স্ + ক্ + অ] ক্ ও স্ নিজেদের মধ্যে স্থান বিনিময় করেছে। রিক্শা > রিশ্কা ইত্যাদি।

দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস / স্পুনরিজম্ - একটি বাক্যের মধ্যে পরস্পর থেকে দূরে অবস্থিত ধ্বনির মধ্যে পারস্পরিক স্থান-বিনিময় ঘটে। এই প্রক্রিয়াকে দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস বা বাক্যের অন্যোন্য ধ্বনি বিপর্যাস বলা হয়। অক্সফোর্ডের ডঃ স্পুনারের উচ্চারণে এরকম ধ্বনি বিপর্যাস প্রায়ই ঘটত বলে এই প্রক্রিয়াকে ভাষাবিজ্ঞানে স্পুনরিজ্ম্ বলে।
যেমন - মেক টি > টেক মি। এক কাপ চা > এক চাপ কা। গলে জল হয়ে গেছে > জলে গল হয়ে গেছে ইত্যাদি।

অপিনিহিতিঃ অনেক সময় শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' থাকলে সেটা যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সেই ব্যঞ্জনের আগে সরে এসে উচ্চারিত হয়। এছাড়া শব্দে য - ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন বা 'ক্ষ' বা 'জ্ঞ' থাকলে তার আগে অনেক সময় একটা অতিরিক্ত 'ই' বা 'উ' উচ্চারিত হয়। এই উভয় প্রক্রিয়াকে অপিনিহিতি বলা হয়। যেমন - বাক্য > বাইক্ক, করিয়া > কইর‍্যা [ক্ + অ + র্ + ই + আ] > [ক্ + অ + ই + র্ + য্ + আ] অনেকে এই অপিনিহিতিকে স্বরধ্বনির বিপর্যাস বলেছেন। কিন্তু এটা দুটো স্বরধ্বনির পারস্পরিক স্থান বিনিময় নয়, একটি ধ্বনির স্থানান্তর।

ভাষার অন্তরঙ্গ ও অর্থ প্রভাবিত কারণে ধ্বনিপরিবর্তনঃ

সাদৃশ্যঃ মনে রাখার সুবিধার জন্যে বা উচ্চারণের সুবিধার জন্যে বা উচ্চারণের বৈষম্য হ্রাস করার জন্যে যখন আমরা কোন ধ্বনি বা রূপ বা অর্থকে অন্য কোন শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা অনুরূপ কোন নতুন শব্দ গড়ে নিই তখন সেই প্রক্রিয়াকে বলে সাদৃশ্য। সাদৃশ্যের ফল চাররকম হতে পারে - ক) শব্দের ধ্বনি পরিবর্তন, খ) শব্দের রূপ পরিবর্তন, গ) শব্দের অর্থ পরিবর্তন এবং ঘ) নতুন শব্দ সৃষ্টি। যেমন - টাকার কুমীর, 'কুমীর' শব্দটা এসেছে ধন সঞ্চয়ের দেবতা 'কুবের' থেকে। বাংলায় শব্দটি টাকার 'কুবীর' বা 'কুবের' হওয়া উচিত ছিল কিন্তু হয়েছে টাকার 'কুমীর'। এখানে 'কুবীর' শব্দটি 'কুমীর' শব্দের সাদৃশ্যে পরিবর্তিত হয়ে এই রূপ লাভ করেছে - এখানে 'ব্' থেকে 'ম্' এই ধ্বনি পরিবর্তনটি সাদৃশ্যের প্রভাবেই ঘটেছে।
'হাঁস' ও 'পাতাল' এ দুটো শব্দের সাদৃশ্যে ইংরেজি শব্দ 'হসপিট্যাল' বাংলায় হয়েছে 'হাঁসপাতাল'।

বৈদিক শব্দ 'ক্রন্দসীর' মূল অর্থ ছিল 'গর্জনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সৈন্য।' আবার বৈদিক 'রোদসী' শব্দের অর্থ 'দুই জগত' [স্বর্গ ও পৃথিবী] > অন্তরীক্ষ। এই 'রোদসী' শব্দের সাদৃশ্যে 'ক্রন্দসী' শব্দটির নতুন অর্থ রবীন্দ্রনাথ করেছেন 'অন্তরীক্ষ' রবীন্দ্র - প্রয়োগে রোদসী শব্দের সাদৃশ্যে ক্রন্দসী শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে। ডঃ সুকুমার সেন দেখিয়েছেন - মূল শব্দ 'বধূটি' থেকে বাংলায় ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে এসেছে 'বউড়ী'। এই 'বউড়ী' শব্দের সাদৃশ্যে বাংলায় 'শাশুড়ি' > শাউড়ি, 'ঝিউড়ী' প্রভৃতি নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।

বিমিশ্রণ / মিশ্রণঃ যদি একটা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে তার সঙ্গে ভাবানুষঙ্গের জন্য অন্য কোন শব্দ মনে এসে যায় এবং মূল শব্দের অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে সেই জায়গায় মনে আসা শব্দটি যোগ করে দেওয়া হয় এবং তার ফলে যে নতুন একটা শব্দ সৃষ্টি হয়, তবে তাকে বিমিশ্রণ বা মিশ্রণ বলা হয়। যেমন - পর্তুগীজ 'আনানস' শব্দের 'নস' অংশটুকু বাদ দিয়ে তার জায়গায় বাংলায় 'রস' শব্দ যোগ হয়েছে এবং তার ফলে নতুন শব্দ 'আনারস' শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। এখানে যে ফলের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রস থাকে বলে বাংলা 'রস' শব্দটির কথা মনে এসেছে। এখানে 'আনানস' ও 'রস' শব্দের মিশনে নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে 'আনারস'।

জোড়কলম শব্দঃ একটি শব্দের বা তার অংশ বিশেষের সঙ্গে অন্য শব্দ বা তার অংশবিশেষ যোগ করে যদি কোন নতুন শব্দ তৈরি হয় তবে সেই শব্দকে জোড়কলম শব্দ বলা হয়। যেমন - 'নিশ্চল' শব্দের প্রথম অংশের সঙ্গে 'চুপ' শব্দটি যোগ করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন 'নিশ্চুপ' শব্দ। রবীন্দ্রনাথ আরও সৃষ্টি করেছেন ঝট্ + তড়িৎ = ঝটিত্ । এখন বহু প্রচলিত - ধোঁয়া = কুয়াশা = ধোঁয়াশা। হাঁস + সজারু = হাঁসজারু [সুকুমার রায়ের কবিতায় আছে]।

সঙ্কর শব্দঃ বিভিন্ন ভাষার উপাদান যোগ করে নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে সঙ্কর শব্দ বা মিশ্র শব্দ বলে। যেমন - ইংরেজি শব্দ 'মাস্টার' + বাংলা প্রত্যয় 'ঈ' = মাস্টারী। বাংলা পুরঃ সর্গ 'নি' + ফারসী শব্দ 'খরচা' = নিখরচা। বিমিশ্রণ বা জোড়কলমে দুটি বা একটি শব্দের অংশবিশেষ নেওয়া হয়, কিন্তু সঙ্কর শব্দে যে উপাদানটি নেওয়া হয় সেটি গোটাই নিয়ে যোগ করা হয়।

লোকনিরুক্তিঃ নিরুক্তি মানে বুৎপত্তি বা উৎস নির্ণয়। শিক্ষিত মানুষের নয়, লোক - সাধারণের অর্থাৎ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের জ্ঞান - বিশ্বাস অনুসারে নির্ণীত ব্যুৎপত্তির উপরে নির্ভর করে শব্দের যে ধ্বনিপরিবর্তন হয় তাকে লোকনিরুক্তি বলে। যেমন - বৈদিক ভাষায় 'মাকড়সার' প্রতিশব্দ ছিল 'ঊর্ণবাভ'। এই মূল শব্দটি 'বভ্' [বয়ন করা] ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এই 'বভ' ধাতু পরে অপ্রচলিত হয়ে যায়। এবং লোক সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে মাকড়সা নিজের 'নাভি' থেকে সুতোর মতো একরকম লালারস ব্যাড় করে তা থেকে জাল তৈরি করে। লোক বিশ্বাসে ঐ 'নাভি' শব্দের উপরে ভিত্তি করেন শব্দটির নতুন বুৎপত্তি করে নেওয়া হয় এবং 'ঊর্ণবাভ' শব্দটির সেই অনুযায়ী ধ্বনিপরিবর্তন হওয়ায় শব্দটি হয়ে যায় 'ঊর্ণনাভ'। ঠিক একই ভাবে লোক বিশ্বাসে 'আর্ম চেয়ার' হয়েছে 'আরাম চেয়ার' বা 'আরাম কেদারা'। আর্ম চেয়ারে বসলে আরাম পাওয়া যায় এই ধারনায় 'আর্ম' হয়েছে 'আরাম'।

ভুয়া শব্দঃ অনেক সময় শব্দের একটা কল্পিত মূল উপাদান খাড়া করে নিয়ে তার সঙ্গে বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি যোগ করে এমন শব্দ গঠন করা হয় যার মূল উৎস ভাষায় ছিলই না। যেমন - 'প্রোথিত' শব্দ। এখানে কল্পিত মূল উপাদান 'প্রোথ' ধাতু। এর সঙ্গে 'ইত' প্রত্যয় যোগ করে হয়েছে 'প্রোথিত'। কিন্তু এর মূল যে 'প্রোথ' ধাতু সেটি কাল্পনিক ধাতু, সংস্কৃতে এর উৎস পাওয়া যায় না।